ইউনিট ১১

উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংস্কারকদের অবদান

ভূমিকা

আধুনিক সমাজকল্যাণ প্রাচীন সমাজসেবী, সমাজসংস্কারক, মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্বের শ্রম সাধনার ফলশ্রুতি। যুগে যুগে মানবহিতৈষী দর্শন ও ধর্মীয় মুল্যবোধ সমাজসেবায় মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে কখনো একাকি কখনো যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, কুপ্রথা, ক্ষতিকর রীতি-নীতির মুলোৎপাটনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ জীবনকে সুচারুভাবে পরিচালনায় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন সমাজকল্যাণের ইতিহাসে তাঁরা আমাদের পথপ্রদর্শক। সময়ের আবর্তে শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজ জীবনের উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় তাঁদের তৎপরতায় সমাজকল্যাণ আজ সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব সমাজদরদী ব্যক্তিদের মধ্যে উপ-মহাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সমাজসেবী ও সমাজ সংস্কারকদের অবদান তুলে ধরা হলো ঃ

এই ইউনিটের পাঠগুলো হলো

পাঠ-১১.১ ঃ হাজী মুহম্মদ মুহসীন
পাঠ-১১.২ ঃ রাজা রামমোহন রায়
পাঠ-১১.৩ ঃ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
পাঠ-১১.৪ ঃ স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান
পাঠ-১১.৫ ঃ বেগম রোকেয়া
পাঠ-১১.৬ ঃ এ কে ফজলুল হক
পাঠ-১১.৭ ঃ নবাব ফয়জুন নেসা

পাঠ ১১.১ ঃ হাজী মুহম্মদ মুহসীন (Haji Muhammad Muhashin) (১৭৩২–১৮১২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১১.১ঃ১ হাজী মুহম্মদ মুহসীন কে ছিলেন তা বলতে পারবেন

☞ ১১.১ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে মুহসীনের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.১ঃ১ জন্ম ও পরিচিতি

মহানুভবতা ও দানশীলতার ইতিহাসে জীবিত অবস্থায় কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হাজী মুহম্মদ মুহসীন, অবিভক্ত ভারতে ১৭৩২ সালে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী নগরে এক ধার্মিক ও বনিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী ফয়েজ উল্লাহ একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যে ও পরিবেশে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলেও তিনি কৈশোরে শিক্ষা লাভের জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন। সেখানে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষা ও সংগীত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনে ইরান, তুরস্ক, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশ সফর করে মক্কায় হজ্জব্রত পালন শেষে ১৭৮৯ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মন্নুজান নামে তার এক নিঃসন্তান সৎবোন ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতার দেয়া অঢেল সম্পদের মালিক। মুহসীন দেশে ফেরার কয়েকদিন পরই মন্নুজানের মৃত্যু ঘটে। পিতার দেয়া বিশাল সম্পত্তির মালিকানা সংগত কারণেই মুহসীন লাভ করেন কিন্তু নিজে আজীবন চিরকুমার থেকে সমুদয় সম্পত্তি জনগণের কল্যাণে ব্যয় করে যান।

১১.১ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে মুহসিনের অবদান

১. **শিক্ষাক্ষেত্রে ঃ** ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ জনগণের মাঝে শিক্ষার দ্যুতি ছড়ানোর জন্য তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। ১৮০৬ সালের ২৬ এপ্রিল তাঁর বিশাল সম্পত্তি থেকে ১,৫৬,০০০ টাকা নিয়ে মুহসিন ট্রাষ্ট গঠন করেন। যার আয় থেকে এখনও হাজার হাজার শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা লাভ করে থাকে। শিক্ষার প্রসারের জন্য নিজ এলাকায় হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ধর্ম শিক্ষার জন্য তিনি বহু মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ নির্মাণ ও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করেন। অমুসলিম ছাত্রদের জন্য তিনি উদারভাবে দান করেন।

২. **জনহিতকর কার্য ঃ** মুহসীন জীবিত অবস্থাতেই খুলনা ও যশোর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য বহু দীঘি, পুকুর ও খাল খনন করেন। লবনাক্ততা থেকে জনগণের ফসল রক্ষার জন্য তিনি বহু বাঁধ ও বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করেন। নিজের এলাকাতেও জনস্বার্থে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হুগলীতে অবস্থিত "ইমামবাড়া" জনহিতকর কাজের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

৩. **জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ঃ** জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁর স্মরণীয় দান হচ্ছে হুগলীতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। তাছাড়া, দরিদ্রদের মাঝে বিনামুল্যে ওষুধপত্র বিতরণ, চিকিৎসা প্রদান এবং চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য অন্যতম।

৪. **দানবীর হিসেবে ঃ** বঙ্গের হাতেম তাই নামে খ্যাত মুহসিন তাঁর অগাধ সম্পত্তি জনকল্যাণে দান করে যান। গরীব, দুঃখী, অন্ধ, এতিম, বৃদ্ধ অসহায়দের তিনি উদারভাবে দান করতেন। তাঁর দানের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এমনকি চোর-ডাকাতও ভেদাভেদ ছিলনা।

পরিশেষে বলা যায়, মানবতাবোধ ও ত্যাগের ক্ষেত্রে তিনি অনুকরনীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। কবির ভাষায় বলা যায়,

"পুণ্য শ্লোক, দানবীর, মহাপ্রাণ, হে হাজী মুহসিন
কে বলে মরেছ তুমি, হে অমর আজ চিরদিন।"

সার-সংক্ষেপ

অবিভক্ত বাংলার ক্রান্তিলগ্নে যে সব দানবীর মানবকল্যাণে অভাবনীয় অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন চির স্মরণীয়। তাঁর জনহিতকর কার্যাবলী আগামী দিনে দানশীল ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বর্তমান সমাজে তার মতো বিদ্যোসাহী ও দানশীল ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন

১. হাজী মুহম্মদ মুহসীন কখন জন্ম গ্রহন করেন?

ক) ১৭১২ খ) ১৭৩২

গ) ১৭৯২ ঘ) ১৮২২

২. হাজী মুহম্মদ মুহসীন ১৮০৬ সালে কত টাকা নিয়ে মুহসীন ট্রাষ্ট গঠন করেন।

ক) ১,৫৬,০০০ খ) ১,৭৬,০০০

গ) ১,৮৩,০০০ ঘ) ১,৯৩,০০০

৩. ইমাম বাড়া কোথায় অবস্থিত

ক) বর্ধমানে খ) মুর্শিদাবাদে

গ) হুগলীতে ঘ) পাটনায়।

পাঠ-১১.২ ঃ রাজা রামমোহন রায় (Raja Ram Mohan Roy) (১৭৭২–১৮৩৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১১.২ঃ১ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম পরিচিতি বলতে পারবেন পারবেন

☞ ১১.২ঃ১ সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজ রামমোহনের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক চিন্তা চেতনার ধারক ও বাহক, কট্টর বর্ণবাদী হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ, সামাজিক সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী, নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্র পথিক রাজা রামমোহন রায়। তাই কেউ তাকে ভারতের আধুনিক যুগের প্রবর্তক, কেউ মানবতার প্রবক্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১১.২ঃ১ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম পরিচিতি

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা যখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, চরম বর্ণবাদ, ধর্মের নামে দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য সেই সময় ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) সালের ২২ শে মে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মন পরিবারে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশগত পদবী ছিল বন্দোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার নবাবের অধীনে চাকরি করতেন। নবাবের কাছ থেকে তারা রায় রায়হান উপাধি লাভ করেন।

প্রখর মেধাবী ও জ্ঞানান্বেষী রাজা রামমোহন চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মাতৃভুমি রাধা নগরেই অতিবাহিত করে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে একজন অধ্যাপকের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন। কট্টর হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের গ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও বাইবেল অধ্যয়ন করেন। একজন মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, ইংরেজী, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করে নিরাকার একেশ্বর বাদে অনুপ্রাণিত হন। তিনি হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে একেশ্বর বাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। তাই পৈত্রিক ধর্মের মুর্তি পুঁজার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। ফলে পিতা, পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে গৃহত্যাগে বাধ্য হয়ে তিব্বতে চলে যান এবং সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। সেখানেও তিনি তার মতবাদ প্রচার করতে যেয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়ে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন এবং হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দিল্লীর সম্রাট ২য় আকবর ১৮৩০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে সম্রাটের কতিপয় দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তাঁকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন এবং তাঁর আভিজাত্যের প্রতীক রুপে রামমোহনকে "রাজা" উপাধিতে ভুষিত করেন।

১১.২ঃ২ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

আধুনিক চিন্তা চেতনার প্রতীক রাজা রামমোহনের ঘটনা বহুল অবদানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হলো ঃ–

ক. **ধর্মসংস্কার ঃ** পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী রামমোহন হিন্দু ধর্মের প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত হানেন। ইসলামের সুফীবাদ ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একেশ্বরবাদী ও নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী হন। ১৮০৩ সালে আরবী ও ফারসী ভাষায় 'তুহফাত উল মুহাহিদীন' বা একেশ্বর বাদীদের প্রতি 'উপহার' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং একই সময় 'মানজারাতুল আধিয়ান' বা 'বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮১৫ সালে তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আত্মীয় সভা গঠন করেন। সেখানে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্রহ্ম সংগীত অনুষ্ঠিত হতো। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে সার্বজনীন ধর্মের কথা বলা হতো।

খ. **সমাজ সংস্কার ও সতীদাহ প্রথা নিরোধ ঃ** সমাজের কু-প্রথা ও কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মুল্যবোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবর্তন সাধনের জন্য রাজা রামমোহন ব্যাপক জনমত গঠন করেন। ফলে বিভিন্ন ঘৃন্য ও অমানবিক কু-প্রথা যেমন– শিশু কন্যা বলি দান, বহুবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। মুলত ধর্ম সংস্কারের মুলে তার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার। মানবতার ইতিহাসে প্রাচীন হিন্দু সমাজে সবচেয়ে অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রথা ছিল সতীদাহ। এ প্রথা অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পরে একই চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুঁড়িয়ে মারা হত। তিনি হিন্দু ধর্ম ও বিভিন্ন শাস্ত্র বিশ্লেষন করে প্রমান করেন এটি ধর্ম বিরুদ্ধ এবং তা বাতিলের জন্য জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য লেখনী ধারন করে সতীদাহ প্রথার অসারতা প্রমান করেন। কিন্তু কট্টর হিন্দুরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। তবে রাজা

রামমোহন রায়ের আহবানে সারা দিয়ে প্রগতিশীল সমাজ বৃটিশ রাজশক্তিকে এই প্রথার অসারতা বুঝাতে সমর্থ হলে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে সতীদাহ উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে আত্মাহুতির নামে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাকে দন্ডনীয় ঘোষনা করা হয়।

গ. **শিক্ষা বিস্তারে ঃ** ভারত বর্ষে শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একটি অনুরোধ পত্র লিখেছিলেন । তিনি নিজ ব্যয়ে ও বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় ১৮২২ সালে কলকাতায় 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতে ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা দেয়া হত। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ১৮২৬ সালে **বেদান্ত কলেজ** স্থাপন করেন এবং একই বছর সংস্কৃত মুক্ত স্বাধীন ব্যাকরণ রচনা করেন তার রচিত উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে **বেদান্ত গ্রন্থ** ও **বেদান্ত সার**। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ জীবনথেকে কুসংস্কার, অন্ধতা ও মুর্তি পুঁজা বন্ধ করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নাই।

ঘ. **রাজনৈতিক চেতনায় ঃ** রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও জাতীয় জাগরণে রামমোহন রায় সচকিত ছিলেন। ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" নামক পত্রিকায় তিনি রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনায় জনগণকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াস পান। ১৮২৩ সালে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী সংবাদপত্র বিধি পাস হলে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিবাদ উত্থাপনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের দুর্দশার কথাও পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও আন্তর্জাতিক মননশীলতার প্রতিফলন ঘটে।

পরিশেষে, ভারত বর্ষে যখন কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করছিল তখন জ্বাজল্যমান রশ্মির ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটলেও তাকে আজীবন কুসংস্কার ও কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। কৈশোর থেকে মহাপ্রয়ান পর্যন্ত মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে ভারতের সমাজকে আলোকিত করে গেছেন। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টল নগরীতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সার সংক্ষেপ

কট্টর পন্থী ভারতবর্ষের ধর্মীয় আবরনে বিদ্যমান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন ছিলেন শান্তির দুত। সাম্প্রদায়িকতার জাল ছিন্ন করে উদার নৈতিক সমাজ নির্মাণের দ্রষ্টা। এক্ষেত্রে নানা প্রতিকুলতা সত্বেও তিনি সফল হয়েছেন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম তারিখ কত?

ক) ২২শে জুন খ) ২২শে মে

গ) ১৫ই জুলাই ঘ) ১৭ই আগষ্ঠ

২. তুহফাত উল মুহাহিদীন কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক) ১৮০০ খ) ১৮০২

গ) ১৮০৩ ঘ) ১৮০৫

৩. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

ক) ১৮২১ খ) ১৮২৫

গ) ১৮২৯ ঘ) ১৮৩৫

পাঠ ১১.৩ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (Iswarchndra Biddashagor) (১৮২০–১৮৯১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১১.৩ঃ১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ও পরিচয় বলতে পারবেন
- ☞ ১১.৩ঃ২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে বর্ণণা করতে পারবেন
- ☞ ১১.৩ঃ৩ সমাজ সংস্কার ও হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা ঃ ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তাধারা ও আইনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক, মানবতাবাদী পন্ডিত, স্বনামধন্য সমাজসংস্কারক, শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১১.৩ঃ১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ও পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুর দাস বন্দোপাধ্যায় কলকাতায় সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। হতদরিদ্র্য পরিবারে জন্ম নিয়েও সৎ ও পরহিতৈষী পিতা-মাতার সুযোগ্য সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র কঠোর মনোবল, প্রখর মেধা, ঐকান্তিকতা ও আদর্শের গুণে একজন কালজয়ী দেশ বরেণ্য ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কোলকাতায় সংস্কৃতি কলেজে অধ্যয়নকালে তার অগাধ পান্ডিত্য ও মেধার স্বীকৃতি স্বরুপ শিক্ষক মন্ডলী তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভুষিত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিসেবেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১১.৩ঃ২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান

আধুনিক ভারতের দ্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে সমাজকল্যাণ ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান ফুটে উঠে। সমাজ কল্যাণের দৃষ্টিকোণ হতে তার কর্মধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

শিক্ষা বিস্তার ঃ শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রষ্ঠাকরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতায় একটি হিন্দু বলিকা বিদ্যালয় স্থাপন, ১৮৫৩ সালে নিজ গ্রামে দিবা-নৈশকালীন দুটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁর শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম কৃতিত্ব। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার বহন করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে গ্রীষ্মকালীন ছুটি প্রবর্তন করা হয়। তৎকালীন সময়ে মাতৃ ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিলনা বলেই চলে। তিনি ১৪টি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ বিধানে তিনি এক কিংবদন্তী। সাহিত্যিক হিসেবে বিদ্যাসাগর ৫২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যতম রচনা বর্ণমালা, কথামালা, বোধদয়, বেতাল, পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বাসুদেব চরিত। তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে এদেশের সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য লেখনী ধারন করেছিলেন।

১১.৩ঃ৩ সমাজ সংস্কার ও হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগরের অমরকীর্তি হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন। তাঁর নিজের ভাষায়, "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।" পূর্বে রীতি ছিল হিন্দু নারীর পতি মারা গেলে সে আর বিয়ে করতে পারবে না। ১৮২৯ সালে প্রণীত সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইনের ফলে হিন্দু বিধবারা সহমরণ থেকে মুক্তি পেলেও বিধবা বিবাহের রীতি না থাকায় বিধবারা মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। সমাজের অবহেলা, ঘৃনা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কেউবা অসামাজিক পথে পা বাড়ায়।

১৮৫৩ সালে তিনি এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বিধবা বিবাহের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরিত একখানা স্মারকলিপি ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। এতে বলা হয় যে, "দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ শাস্ত্র সম্মত নয়। আন্দোলনকারীরা মনে করেন শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাঁধা প্রবল আকার ধারণ করেছে ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তা অপসারন করা।"

১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হলে ভারতের সর্বত্র পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। রাজা রাঁধা কান্ত দে এর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট দাখিল করেন। পরিশেষে নানা বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে লর্ড ডার্লহৌসীর সহায়তায় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হলেও তা বাস্তবায়ন সহজ হয়নি। ১৮৭০ সালের ১১ই আগষ্ট নিজ পুত্র নারায়নচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বিয়ের মাধ্যমে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বহুবিবাহ এবং বাল্য বিবাহ রোধেও তিনি প্রয়াস চালান।

জনসেবা ঃ নিঃস্বার্থ সমাজসেবী ক্ষণজন্মা পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন মানবতাবাদী চেতনার বাহক। দীন-দুঃখী, গরিব অসহায়, দুস্থ-দুর্দশাগ্রস্থ, অক্ষম, রুগ্ন, বিপন্ন ও বিপদগ্রস্থ শ্রেণীর সাহায্যে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকালে তিনি মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় শিবির, লঙ্গরখানা ও অন্নছত্র খোলেন। বীরসিংহে তিনি নিজ ব্যয়ে এক অন্নছত্র খোলেন, যেখানে দিন-রাত্রি অবিরাম খাদ্য পরিবেশিত হত। এখানে বসবাসরত ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিচু শ্রেণী, সন্তান সম্ভবা মহিলা সকলকে তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন। তাই তিনি **দয়ার সাগর** উপাধি পান।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজসংস্কার ও সমাজসেবার ইতিহাসে এক অবিস্মরনীয় নাম ঈশ্বরচন্দ্র। বিশেষত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের কঠোর বর্ণবৈষম্য, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে নানা অপমান, তিরষ্কার ও লাঞ্চনা উপেক্ষা করে নবযুগের আলোক বর্তিকা নিয়ে এসেছিলেন। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর **বীরঙ্গনা** কাব্যে লিখেছিলেন,

" বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুনার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু উতল জগতে
হিমাদ্রির হেম ক্লান্তি ম্লান কিরণে। "

সার-সংক্ষেপ

সমকালীন হিন্দু সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কু-প্রথা ও কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণে নিয়োজিত সমাজ কর্মীগণ ও তাঁর অবদান কে চিরদিন স্মরণ করবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন সালে জন্ম গ্রহন করেন?

ক) ১৮২০ খ) ১৮৩০
গ) ১৮৪০ ঘ) ১৮৫০

২. সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতটি গ্রন্থ রচনা করেন?

ক) ২২ খ) ৩২
গ) ৪২ ঘ) ৫২

৩. হিন্দু বিধবা আইন কখন পাস করা হয়?

ক) ১৮৪৬ খ) ১৮৫৬
গ) ১৮৬৬ ঘ) ১৮৭৬

পাঠ ১১.৪ ঃ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (Sir Syad Ahmed Khan) (১৮১৭–১৮৯৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১১.৪ঃ১ স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের পরিচিতি বলতে পারবেন।
- ☞ ১১.৪ঃ২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের অবদান বলতে পারবেন।
- ☞ ১১.৪ঃ৩ আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ সিপাহি বিদ্রোহ জনিত ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে চরম বৈপরিত্য অবস্থানের কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের এড়িয়ে চলা শুরু করে। ফলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মুসলমানগণ যখন চরম দুরবস্থায় নিপতিত তখন ত্রাণকর্তা হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান।

১১.৪ঃ১ স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের পরিচিতি

১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ রাসুল (সঃ)-এর বংশধর ছিলেন। সংগত কারনেই তাঁদের আচার আচরণে সহৃদয়তা, আদর্শ, সৌজন্যতা ছিল অনুকরণীয়। কর্মজীবনে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়ের ফলে তিনি আগ্রায় নায়েব বাহাদুরের কমিশনার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৮৪১ সালে ব্রিটিশ সরকারের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব চলাকালে তিনি সাব-জজ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহকালীন ইংরেজ নিধন ও পরবর্তী সময় ইংরেজরা যখন ভারতীয়দের রাজদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদন্ড দিতে শুরু করে তখন তাঁর মধ্যস্থতায় ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

১১.৪ঃ২ স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের অবদান

ইংরেজদের রোষানলের স্বীকার মুসলমানদের অন্ধ, অশিক্ষার গহবর থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের উজ্জল আলোতে আনয়ন করাই ছিল স্যার সৈয়দ আহমদের স্বপ্ন। তাই তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ পরিহার করে আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান।

১১.৪ঃ৩ আলীগর আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার

ব্রিটিশ শ্বাসিত ভারতে সামাজিক শোষণ, রাজনৈতিক বঞ্চণা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করে অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে মর্যাদা সহকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান পরিচালিত **আলীগড় ভিত্তিক** আন্দোলনই ইতিহাসে আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ধর্মীয় গোড়ামি দুরীকরণ, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার দুরীভূত করে মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার ও আত্ম বিশ্লেষনের সুযোগ সৃষ্টি।

২. ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সরকারের আস্থা অর্জন।

৩. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. ব্রিটিশ প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সমকক্ষ করে তোলা।

৫. হিন্দু জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায় মুসলামানদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রকৃত পক্ষে, আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। আলীগড় আন্দোলন পরিচালনা করতে যেয়ে তিনি নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক. **বিজ্ঞান সমিতি গঠন ঃ** মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তা-রের লক্ষ্যে তিনি ১৮৬৩ সালে গাজীপুরে একটি বিজ্ঞান সমিতি ও কালকাতায় একটি মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। পরবর্তীতে এটি 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ নামে পরিবর্তিত হয়।

খ. **পত্রিকা প্রকাশ ঃ** মুসলমানদের ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত করে সামাজিকভাবে সচেতন করার জন্য ১৮৬৯ সালে 'তাহযিব-উল-আখলাক' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন কুসংস্কার, দাসপ্রথা, পীরমুরিদ সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখিত পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

গ. **ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন ঃ** মুসলমানদের মধ্যে উন্নত চিন্তা ধারার প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য এ সমিতি গঠন করেন। এ সমিতির মাধ্যমে ১৮৭৫ সালের মে মাসে "Mohamadan Anglo Oriental College" স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে আলীগড় কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। স্যার সৈয়দ আহমদের স্বপ্ন ছিল অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে মুসলমানদের জন্য উচ্চতর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার জন্য এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে ১৯২০ সালে আলীগড় কলেজটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে।

ঘ. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ঃ** স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সর্বোপরি, মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি, মুসলিম নবজাগরণ, আধুনিক জীবন ধারা ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে স্যার সৈয়দ আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৮ সালের ২৭ মার্চ এ মহাপ্রাণ, সমাজ সংস্কারক চির নিদ্রায় শায়িত হন।

সার-সংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রসার ও সাম্পদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের ও স্বাধীকার আন্দোলনের অগ্রদুত ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। তৎকালীন মুসলমানদের ইংরেজদের রোষানল থেকে রক্ষা, ইংরেজি সংস্কৃতি বর্জন, হতাশা ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্তির জন্য তাঁর সমঝোতামূলক প্রয়াস চির জাগরুক থাকবে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান কখন জন্ম গ্রহন করেন?

ক) ১৮০৭ খ) ১৮১৭

গ) ১৮২৩ ঘ) ১৮৩৩।

২. এই পাঠে আলীগড় আন্দোলনের কয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উলেখ করা হয়েছে।

ক) ৩ টি খ) ৪টি

গ) ৫ টি ঘ) ৬টি।

৩. আলীগড় কলেজটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় কত সালে?

ক) ১৯১০ খ) ১৯১৫

গ) ১৯২০ ঘ) ১৯২৫।

পাঠ ১১.৫ ঃ বেগম রোকেয়া (Begum Rokeya) (১৮৮০–১৯৩২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১১.৫ঃ১ বেগম রোকেয়ার জন্ম ও পরিচয় বলতে পারবেন
- ☞ ১১.৫ঃ২ নারী জাগরণের অগ্রদুত হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ১১.৫ঃ৩ বেগম রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, কুপমুন্ডকতায় আচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায় নারী ছিল অবহেলা আর বঞ্চণার শিকার। নারী জাতির অমানিশা দুরীভূত করার ক্ষেত্রে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় নাম বেগম রোকেয়া। নারী আন্দোলন, সমাজ সংস্কার ও ভাষা সাহিত্যের বিকাশে তিনে মুসলিম নারী জাগরনে অগ্রদুত হিসেবে স্বীকৃত ও স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন।

১১.৫ঃ১ বেগম রোকেয়ার জন্ম ও পরিচয়

১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠা পুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকয়ার জন্ম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আলী সাবের এবং মাতার নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরাণী। বেগম রোকেয়া যখন জন্মগ্রহন করেন তখন মুসলিম সমাজ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুপমন্ডুকতার ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। পাঁচ বছর বয়স থেকেই মেয়েরা শুধু পর পুরুষদের সামনে নয় অনাত্মীয় মহিলাদের সামনেও বের হতে পারত না। তখন নারী শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ। সামান্য কিছু আরবী ও ফার্সী শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। বেগম রোকেয়ার অদম্য আগ্রহে উদার ও প্রগতিশীল বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের সহযোগিতায় শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়। বাবার অজান্তে গভীর রাতে মোমের আলোতে বড় ভাইয়ের স্নেহে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পান। প্রায় ১৭ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ৩৮ বছর বয়স্ক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়ার বিয়ে হয়। শিক্ষার প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ দেখে বিদ্যার্জনে তার স্বামী তাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করেন। "সুলতানার স্বপ্ন" গ্রন্থটি তার স্বামীর অনুপ্রেরণারই ফসল।

১১.৫ঃ২ নারী জাগরণের অগ্রদুতী হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান

নারী মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষয়িত্রী, সমাজসংস্কারক, সাহিত্যসেবী ও সমাজসেবক বেগম রোকেয়ার বহুমুখী কর্ম ধারার কয়েকটি বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী জাগরন ঃ বেগম রোকেয়া উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন যে অবরোধ প্রথার বিলোপ করতে হলে নারী শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালের ১লা অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণে ১৯১১ সালে বাধ্য হয়ে স্কুলটি স্থানান্তর করে কোলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে পুনরায় স্কুলটি চালু করেন। কিন্তু এখানেও তাকে রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা, গঞ্জনা ও ঠাট্টা বিদ্রুপ সইতে হয়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারিতে উন্নীত করা হয়। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ বড়লাট পত্নী "লেডি চেমস ফোর্ড" সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তিনি স্কুলটির সার্বিক অবস্থা এবং মুসলিম নারীর অপূর্ব কীর্তি দর্শণে অভিভূত ও মুগ্ধ হন। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও একান্ত সহযোগিতায় স্কুলটি মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে পরিণত হয়। সর্বপ্রথম ৩জন ছাত্রী এ স্কুল থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে বেগম রোকেয়া শিক্ষাকতার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সরকারের নিকট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবরোধ ও পর্দা প্রথা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, অবরোধ এবং পর্দা দুটি ভিন্ন জিনিস। অবরোধ হচ্ছে গৃহে বন্দী, ধর্মীয় গোঁড়ামী, পর্দার ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি। অবরোধকে তিনি কার্বলিক এসিডের সাথে তুলনা করেছেন যা অতি সন্তর্পনে নারী জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, পর্দা হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম, যার সঙ্গে উন্নতি বা শিক্ষার কোন বিরোধ নেই।

সমাজসেবা ঃ মুসলিম নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, আত্মনির্ভরশীল হয়ে মাথা তুলে দাড়াক, সামাজিক কর্মকান্ডে পুরুষের মত নারীও সমান অবদান রাখতে সক্ষম হোক এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, স্বাবলম্বী মনোভাব সৃষ্টি সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন।

আঞ্জুমানের মাধ্যমে দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষার সুযোগদান এবং বিধবা ও অসহায় মহিলাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনেক দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে বস্তিতে বস্তিতে কুঁটির শিল্প গড়ে তোলা হয়। এছাড়া আঞ্জুমান অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মহিলাদের শিশু পালন ও স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া, তিনি সমকালীন প্রায় সবকটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

সমাজসংস্কারেও তার অবদান অতুলনীয়। নারী-পুরুষ বৈষম্য, নারী জাতির অকর্মন্যতা, বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, তালাক, পীর পুঁজা, একশ্রেণীর মহিলার উচ্ছৃংখল চলাফেরা, ছেলে-মেয়ের ইংরেজি মিশ্রিত নামকরণ ইত্যাদি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

বেগম রোকেয়া বিভিন্ন সমাজসেবা মুলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি' এবং 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর আজীবন সদস্য ছিলেন। পতিতাদের পুণর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'নারী তীর্থ' এর তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে কলকাতায় স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১১.৫ঃ৩ বেগম রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা

বেগম রোকেয়া ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম, জ্ঞানের বিকাশ, সমাজ গঠন ও নারী জাগরণে স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়েছে। তাঁর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সহজ-সরল, তীক্ষ্ম, জোরালো ভাষা এবং যুক্তি। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর সৃষ্টিশীল লেখা রয়েছে। সমসাময়িক কালে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ধুমকেতু, মোহাম্মদী, সওগাত পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হচ্ছে পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, মতিচুর, সুবেহ সাদেক, বিয়েপাগলা বুড়ো প্রভৃতি। তাঁর সাহিত্যকে নারীমুক্তি ও নারীজাগরণের Change Agent বা পরিবর্তনের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস' ও 'বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন যে, "বেগম রোকেয়া বিদ্রুপের শাণিত কষাঘাত নিয়ে মাঠে নামলেন এবং আক্রমন করলেন ব্যক্তিকে নয় সমাজের মনোবৃত্তিকে"।

পরিশেষে বলা যায়, বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের অগ্রদুত। কেননা, নারী সমাজের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দুঃখ-দুর্দশা, অপমান, লাঞ্চনা, কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুপমন্ডুকতা ও অবরোধের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আজকের নারীমুক্তি, নারী জাগরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন বেগম রোকেয়ার স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহিয়সী নারী মৃত্যু বরণ করেন। একই তারিখে জন্ম ও মৃত্যুর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁকে সন্নিবেশিত করা যায়।

সার সাংক্ষেপ

পাক-ভারত উপমহাদেশে তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার মুলে কুঠারাগাত করে রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও বেগম রোকেয়া নারী মুক্তি ও প্রগতির ক্ষেত্রে এক অনন্য ও চির স্মরণীয় নাম। আজকের নারী নেতৃত্ব, নরীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশ গ্রহন বেগম রোকেয়ার স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বেগম রোকেয়া কত সালে জন্মগ্রহন করেন?

ক) ১৮৬০ খ) ১৮৭০ গ) ১৮৮০ ঘ) ১৮৯০

২. বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্মগ্রহন করেন?

ক) বগুড়া খ) দিনাজপুর গ) চাপাইনবাবগঞ্জ ঘ) রংপুর

৩. বেগম রোকেয়া রচিত অন্যতম গ্রন্থ কোনটি?

ক) নারী খ) সুলতানার স্বপ্ন গ) সাঁঝের মায়া ঘ) কথামালা।

পাঠ ১১.৬ ঃ এ, কে, ফজলুল হক (A. K. Fazlul Haque) (১৮৭৩–১৯৬২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১১.৬ঃ১ এ, কে, ফজলুল হকের জন্ম ও পরিচিতি বলতে পারবেন
- ☞ ১১.৬ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অবদান বর্নণা করতে পারবেন
- ☞ ১১.৬ঃ৩ ফজলুল হক কে কৃষক প্রজার ত্রান কর্তা বলা হয় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.৬ঃ১ এ, কে, ফজলুল হকের জন্ম ও পরিচিতি

ভারতীয় উপমহাদেশের এক কিংবদন্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক, মেহনতী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ও উচ্চ শিক্ষার মশালবাহী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক স্বীয় মেধা ও সাহসী পদক্ষেপের কারণে ব্রিটিশ শাসন হতে আরম্ভ করে পাকিস্তান শাসন কালের এক শতাব্দীর একটি জীবন্ত ইতিহাস। নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন তিনি লড়াই করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার পূর্ণ নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। তাঁর অসীম সাহসীকতার জন্য পাঞ্জাবীরা তাকে **শেরে বাংলা** বা **বাংলার বাঘ** উপাধিতে ভুষিত করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ শৈশব থেকেই ফজলুল হক অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ১৮৮৯ সালে তিনি বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ডিভিশনাল বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১ সালে তিনি কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়ে এফ, এ (বর্তমানে এইচ,এস,সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে একই কলেজ থেকে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে এক বন্ধুর সাথে জিদ করে মাত্র ছয় মাসের প্রস্তুতি নিয়ে অংক শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম, এ পাস করেন। ১৮৯৭ সালে আইন পাস করার পর কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

১১.৬ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ফজলুল হকের অবদান

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের ঘটনা বহুল জীবনে অবহেলিত শ্রেণীর শিক্ষা বিস্তার, বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানো, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সহিত জড়িত ছিলেন। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে তার অবদান সমুহকে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য সেবার ক্ষেত্রে ঃ শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিদ্বেষী মুসলমানগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব। বিভিন্ন কারণে নিম্ন বর্ণের হিন্দু সমাজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই বাস্তব সঙ্গত কারণেই তিনি এই দুই সম্প্রদায়কে শিক্ষার আলোতে টেনে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সভা, সমিতি, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবার মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রতিবারই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিজ দায়িত্বে রেখেছিলেন।

১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯১২ সালে তার বলিষ্ঠ উদ্যোগে "কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি" গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের জন্য বৃত্তি, অনুদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। ১৯২০ সালে আলীগড় ও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রভূত অবদান রাখেন। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ও নারীদের জন্য লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ, বরিশালের চাখার কলেজ, মুন্সিগঞ্জের হরগংগা কলেজ, ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিটি কলেজ, তেজগাঁও কৃষি কলেজ, ইডেন কলেজ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দেন। শিল্পকলার উন্নয়নে বুলবুল ললিত কলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে বালক ও ভারত মুজাহিদ পত্রিকা সম্পাদনা ও নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পদ গ্রহণ করেন। খেলা-ধুলায় বিশেষ আগ্রহ এবং কোলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১.৬ঃ৩ কৃষক প্রজার ত্রান কর্তা ফজলুল হক

ব্রিটিশ শাসিত বাংলার অবহেলেত, শোষিত, নির্যাতিত এবং ঋণগ্রস্থ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে ফজলুল হক যে আন্দোলন গড়ে তোলন তা-ই কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। সে সময় জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের নিদারুন শোষণে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে ছিল। বাংলায় ব্রিটিশরাজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী জমির খাজনা ছাড়াও কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২২ রকমের কর আদায় করতো। খাজনা ও কর প্রদানে ব্যর্থ কৃষকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হত। উপরন্ত, তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে সর্বশ্বান্ত ও পথের ফকিরে পরিণত করতো।

এ প্রেক্ষিতে শেরে বাংলা শুরু করেন তার **ডাল-ভাতের** রাজনীতি। তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করলেন "লাঙ্গল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার।" তাই ১৯১৫ সালে বাকেরগঞ্জে 'নিখিল প্রজা সমিতি', ১৯২৭ সালে বৃহত্তর পর্যায়ে 'বঙ্গীয় কৃষক পার্টি' গঠন করেন। তারই অদম্য প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয়। এবং ১৯৩৭ সালে সেই আইনের সংশোধন করে জমিতে প্রজাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বেআইনী কর আদায় বন্ধ করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় কৃষক ঋণ আইন পাস ও ১৯৩৮ সালে ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন পাসের মাধ্যমে সুদের হার ও চক্রবৃদ্ধি রহিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয় এবং এ কমিশনের সুপারিশেই ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাসের মাধ্যম কৃষক ঋণমুক্তি আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জন করে। কৃষক প্রজাদের জন্য তাঁর এ প্রয়াসের জন্যই তাকে 'কৃষকদের ত্রাণ কর্তা' বলা হয়।

সমাজ সেবা ও দানবীর হিসেবে ঃ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক দৈহিক দিক দিয়ে যেমন বিশালাকৃতির ছিলেন তেমনি হৃদয়ের দিক দিয়েও ছিলেন অনেক উদার ও দরদী। তিনি ছিলেন আমাদের কালের হাজী মুহসীন, আমাদের যুগের হাতেমতাই। তিনি নিজের সুখ বা বিলাসের জন্য অর্থব্যয় কমই করেছেন। কোথাকার দরিদ্র ছাত্র, কোথাকার বিপন্ন পরিবার, কোথায় টাকার অভাবে কার মেয়ের বিয়ে হলোনা, ঘুরে ফিরে অর্জিত অর্থ তাতেই ব্যয় করতেন।

১৮৪১ সালে ভোলা ও পটুয়াখালীতে বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকার উন্নয়নে তিনি অকাতরে অর্থ বিতরণ করেন এবং বিধ্বস্ত বিদ্যালয় সমুহ মেরামত করেন। ১৯৪২ সালে বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষে তিনি ব্যাপক সমাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করেন। বিপন্ন, অসহায়, দুর্ভিক্ষ কবলিত, ক্ষুধার্ত সকল মানুষের সাহায্যার্থে সব সময় সর্বোতভাবে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, খাদেমুল ইসলাম সমিতি সহ বহুসংখ্যক সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার স্বার্থসংরক্ষণে, অবহেলিত শ্রেণীর শিক্ষাবিস্তারে, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, দক্ষ সংগঠক ও মহান নেতা। গণমানুষের মুক্তিদাতা হক সাহেব ১৯৬২ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল মানুষকে কাঁদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কছে বাংলা একাডেমী এলাকায় চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

সার সংক্ষেপ

কৃষক প্রজার মুক্তি, জমিদারী প্রথান উচ্ছেদ, এ দেশের মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের শিক্ষা বিস্তারের মুক্তির মশাল ধারী হিসেবে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের অবদান অতুলনীয়। এ দেশের গতানুগতিক সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বঞ্চিত, অবহেলিতদের স্বার্থ-রক্ষণে ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের এক অনন্য সাধারণ পুরুষ ছিলেন তিনি।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. এ, কে, ফজলুল হক কে শেরে বাংলা উপাধিতে ভুষিত করেন কারা?
   ক) কাশ্মীর খ) পাঞ্জাবী গ) আফগানিস্তান ঘ) ইরানী।

২. ব্রিটিশ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী কৃষকদের কাছ থেকে কত রকমের কর আদায় করতো?
   ক) ২০ খ) ২১ গ) ২২ ঘ) ২৩।

৩. ঋণ সালিশী বোর্ড কখন গঠন করা হয় কখন?
   ক) ১৯৩০ খ) ১৯৩৫ গ) ১৯৩৭ ঘ) ১৯৩৮।

পাঠ ১১.৭ ঃ নওয়াব ফয়জুননেসা (Nawab Faizunnessa) (১৮৩৪–১৯০৩)

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- ☞ ১১.৭ঃ১ নওয়াব ফয়জুন্নেসার জন্ম পরিচিতি বলতে পারবেন
- ☞ ১১.৭ঃ২ সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ১১.৭ঃ৩ শিক্ষা ও সাহিত্যসেবায় তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ অবিভক্ত ভারতীয় রক্ষণশীল মুসলিম নারীদের মধ্যে এক উজ্জল নক্ষত্র নওয়াব ফয়জুন্নেসা সততা, মহানুভবতা, সাহিত্য সাধনা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জনকল্যাণে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংল্যান্ডের তৎকালীন মহারানী ভিক্টেরিয়া তাকে নওয়াব উপাধিতে ভুষিত করেন।

১১.৭ঃ১ নওয়াব ফয়জুন্নেসার জন্ম পরিচিতি

১৮৩৪ সালে ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে কুমিল্লা) লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানান্বেষী, তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন ফয়জুন্নেসা পারিবারিক পরিবেশেই কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলা, আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে দ্রুত বিদুষী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১১.৭ঃ২ সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান

সমাজসেবা, দানশীলতা, ও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে– রাস্তাঘাট, সেতু, কার্লভাট প্রভৃতি নির্মাণ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করণের জন্য দিঘী, জলাশয়, কুপ খনন, চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, মুসাফির খানা নির্মাণ, মক্কা শরীফে মাদ্রাসায় সাওলাতিয়া প্রতিষ্ঠা, মসজিদ ও উপাসনালয় স্থাপন ইত্যাদি। তিনি পাল্কীতে চড়ে নিজ জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন মৌজা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখতেন যা ছিল সেই সময়ে কল্পনাতীত।

১১.৭ঃ৩ শিক্ষা ও সাহিত্যসেবায় তাঁর অবদান

নওয়াব ফয়জুন্নেসা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, তাঁকে নারী শিক্ষার অগ্রদুত বলা যায় নারী শিক্ষার জন্য নিজ গ্রামে এম. ই. স্কুল, কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল ও একটি পাঠশালা, পশ্চিমগাঁও এ স্বীয় কন্যার নামে বদরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় তাঁর অমর কীর্তি। প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ডাকাতিয়া নদীর তীরে পাঠশালা ও সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি বর্তমানে নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারী কলেজ নামে খ্যাত। তাছাড়া, মক্কায় হজ্জব্রত পালনকালে ১৮৯৪ সালে একটি মাদ্রাসা স্থাপন এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপনেও তিনি সাহায্যের হাত বাড়ায়। জমিদারী আয় থেকে তিনি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

সহিত্য সাধনা ঃ কবি, সাহিত্যিক ও সুলেখিকা হিসেবে নওযাব ফয়জুন্নেসা ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সাহিত্য কর্মের অন্যতম নিদর্শণ **রূপজালাল** বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন মুসলমান মহিলা প্রকাশিত ১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ; তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত, সংগীত লহরী এবং সংগীত সার তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় জন্ম নিয়েও স্বীয় সাধনায় তিনি অনন্য অবদান রেখেছিলেন সমাজকল্যাণে। এই বিদুষী ও মহীয়সী নারী ১৯০৩ সালে মাতৃভুমিতে চির নিদ্রায় শায়িত হলেও তার কীর্তিময় জীবন আজও অমলিন।

সার সংক্ষেপ

অবিভক্ত বাংলার রক্ষনশীল মুসলিম সমাজের মধ্যে সমাজসেবা, জমিদারী পরিচালনা, শিক্ষার বার্বিক উন্নয়নে নওয়াব ফয়জুন নেসা দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছেন। দানবীর হাজী মোঃ মুহসীনের জনহিতকর কার্যবলীর সাথে তাঁর দানশীলতাকে তুলনা করা যেতে পারে। তিনিই এক মাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের জন্য দেওয়া শ্রেষ্ঠতম সম্মান নওয়াব উপাধি লাভ করেন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নওয়াব ফয়জুন্নেসা কখন জন্ম গ্রহণ করেন?

ক) ১৮৩৪ খ) ১৮৪৪

গ) ১৮৫৪ ঘ) ১৮৬৪।

২. নওয়াব ফয়জুন্নেসার অন্যতম সাহিত্য কর্ম কী?

ক) অবরোধ বাসিনী খ) রূপজালাল

গ) সোনালী কাবিন ঘ) ধুপ ও ছায়া।

৩. ফয়জুন্নেসাকে নওয়াব উপাধিতে ভুষিত করেন কে?

ক) মহারানী ভিক্টোরিয়া খ) এলিজাবেথ

গ) লেডী চেমস ফোর্ড ঘ) হিলারী ক্লিন্টন।

ইউনিট-১১
অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাজী মুহম্মদ মুহসিন কে ছিলেন?
২. রাজা রামমোহন রায় কে ছিলেন?
৩. সতীদাহ উচ্ছেদের প্রথা বলতে কি বুঝেন?
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ছিলেন?
৫. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন কী?
৬. আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য গুলো কী কী?
৭. বেগম রোকেয়া কেছিলেন?
৮. এ, কে ফজলুল হককে বাংলার কৃষক প্রজার ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন?
৯. সাহিত্য সাধনায় নওয়াব ফয়জুনেসার অবদান কী?

রচনামুলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হাজী মুহম্মদ মুহসীন কে ছিলেন? সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের অবদান আলোচনা করুন।
২. সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করুন।
৩. সমাজ সংস্কার, জনসেবা ও সাহিত্য সাধনায় ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করুন।
৪. সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্থার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁনের অবদান আলোচনা করুন।
৫. নারী জাগরণের অগ্রদুত হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান তুলে ধরুন।
৬. শিক্ষ বিস্তার, কৃষকের ত্রাণকর্তা ও দানবীর হিসেবে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের অবদান তুলে ধরুন।
৭. অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে নওয়াব ফয়জুন্নেসার অবদান আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট ১১

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১	ঃ	১। খ	২। ক	৩।গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২	ঃ	১। খ	২। গ	৩।গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩।খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৪	ঃ	১। খ	২। গ	৩।গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৫	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩।গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৬	ঃ	১। খ	২। গ	৩।ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৭	ঃ	১। ক	২। খ	৩।ক